সাহিত্যের স্বরূপ, বিবর্তন এবং সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি

ভূমিকা
সাহিত্য কী এবং মানব সভ্যতায় এর ভূমিকা কতটুকু—এই নিয়ে যুগে যুগে কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ নানা চিন্তাভাবনা করেছেন। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক রণেশ দাশগুপ্ত তাঁর দীর্ঘ ও তাত্ত্বিক আলোচনায় সাহিত্যের সংজ্ঞাকে কেবল অলংকার বা ভাবের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং মানুষের মেহনত, সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং শ্রেণী সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের প্রকৃত রূপটি উন্মোচন করেছেন।

নিচে প্রবন্ধটির বিস্তারিত রূপরেখা একটি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ আকারে আলোচনা করা হলো:

---

১. শিল্পকলা হিসেবে সাহিত্য ও এর সংজ্ঞা

পৃথিবীতে বহু ধরনের শিল্পী রয়েছেন—যেমন চিত্রশিল্পী, স্থপতি, নর্তক বা অভিনেতা। তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তি, আবেগ ও অনুভূতিকে জাগ্রত করেন। সাহিত্যও ঠিক তেমনি একটি বিশিষ্ট শিল্পকলা, যার প্রধান উপাদান বা সাধনযন্ত্র হলো 'কথা' বা 'শব্দ'।

- শব্দের কারিগরি: শব্দ এবং নিখুঁত পদবিন্যাসের মাধ্যমে রক্ত-মাংসের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলাই কথাশিল্পীর কাজ।
- আবেগের স্পর্শ: যেকোনো শিল্পকলার সার্থকতা নির্ভর করে তা মানুষের হৃদয়কে কতটা নাড়া দিতে পারলো তার ওপর। সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

---

২. সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি

সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু আংশিক ও বৈচিত্র্যময় মতবাদ এসেছে:

- প্রাচীন ও শাস্ত্রীয় মত: গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, সাহিত্য মানুষের আবেগের পরিশোধক (Catharsis)। প্রাচ্যের আলঙ্কারিকদের মতে, সাহিত্যরস হলো 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর'—অর্থাৎ এটি এক প্রকার ঊর্ধ্বলোকের বা শুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মত: প্রমথ চৌধুরীর মতে, যেখানে মধু ও ভ্রমর গুঞ্জনের মেলবন্ধন, সেটাই সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, যা মানুষের চিরকালের সাথী এবং জীবনলীলার দোসর, তাই সাহিত্য।
- আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক মত: কিছু ফরাসি ও আধুনিক ভাষ্যকারের মতে, সাহিত্য হলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক রূপরেখা এবং বিশ্বজগতের মানুষের জীবন পরিচালনার বাহন।

প্রবন্ধকারের মতে, এই সমস্ত সংজ্ঞাই আংশিক বা 'একদেশদর্শী'। কারণ, এগুলো সাহিত্যের পেছনের মূল চালিকাশক্তি—অর্থাৎ সমাজ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে এড়িয়ে গেছে।

---

৩. মানব সমাজের বিবর্তন ও সংস্কৃতির ভিত্তি

সাহিত্যকে বুঝতে হলে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস জানা প্রয়োজন। মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস মূলত দুটি উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার এবং মানুষের মনন বা চেতনা।

- সামাজিক চশমা: অন্য সব প্রাণী প্রকৃতির ডাকে সরাসরি সাড়া দেয়, কিন্তু মানুষ তা দেয় না। মানুষ প্রকৃতিকে

দেখে একটি 'সামাজিক চশমা' দিয়ে, যা তৈরি হয় সমাজ ও অর্থনীতির মেলবন্ধনে।

- **সংস্কৃতির রূপান্তর:** আদিম যুগে শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও দর্শন আলাদা ছিল না; সব মিলেমিশে একাকার ছিল। মানুষের মেহনত ও ভাষার বিকাশের সাথে সাথে সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে এবং তার ভেতর থেকেই পাপড়ির মতো প্রস্ফুটিত হয়েছে সাহিত্য।

---

৪. শ্রেণী সমাজ ও সাহিত্যের ওপর তার প্রভাব

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সমাজে 'শ্রম বিভাগ' (Division of Labor) তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে দাসপ্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম হয়। এর ফলে সমাজ শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

- **চেতনার একচেটিয়া অধিকার:** শ্রেণী সমাজে উৎপাদনের হাতিয়ারের পাশাপাশি 'মনন' বা 'চেতনার' জিম্মাদার হয়ে বসে মালিক বা শাসকশ্রেণী। তারা জ্ঞান ও সাহিত্যকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে।
- **সাহিত্যের দ্বিবিধ রূপ:** শ্রেণী সমাজের প্রভাবে সাহিত্যও বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে থাকে রাজদরবারের 'সাহিত্য দর্পণ' বা 'গীতগোবিন্দ' (উচ্চবিত্তের সাহিত্য), অন্যদিকে থাকে সাধারণ মানুষের 'ডাকের বচন' বা 'শূন্য পুরাণ' (নিম্নবিত্তের লোকসাহিত্য)। শাসকশ্রেণী সবসময় মেহনতি মানুষের সাহিত্য ও অবদানকে বাতিল বা অবজ্ঞা করার চেষ্টা করেছে।

---

৫. মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ (Socialist Realism)

রণেশ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের হাত ধরেই সাহিত্যকে প্রথম সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার সূচনা হয়।

- **সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ:** সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে এই নতুন ধারণার জন্ম। এটি কেবল একটি সাহিত্যিক তত্ত্ব নয়, বরং সমাজ ও মানুষের বাস্তব রূপান্তরের দলিল।
- **শৃঙ্খলমুক্তি:** সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হয় এবং শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঐতিহাসিক ঐক্য গড়ে ওঠে। এর ফলে সাহিত্য শাসকশ্রেণীর শৃঙ্খল ও ফতোয়া থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের 'সমগ্রতা' লাভ করে। এখানে মনন, প্রকৃতি এবং সমাজ এক সূত্রে গেঁথে যায়।

উপসংহার

সাহিত্যের যাত্রা একতারা থেকে সেতারে, কিংবা গুহাচিত্র থেকে মহাকাব্যে রূপান্তরের এক দীর্ঘ ইতিহাস। সাহিত্য কোনো দৈববাণী বা আকাশ থেকে পড়া জিনিস নয়; এটি মানুষের রক্ত-ঘামে ভেজা মেহনত ও সামাজিক অগ্রগতির ফসল। একটি শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজেই কেবল মানুষের চেতনা ও সাহিত্যের বিকাশ পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে পারে—এটাই এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য।

এই নিবন্ধটির কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব, যেমন শ্রম বিভাগ ও দাসপ্রথা, রবীন্দ্রনাথের বাস্তবমুখিতা, কিংবা মার্কস-এঙ্গেলসের সাহিত্য চেতনা নিয়ে আপনি যদি আরও বিস্তারিত আলোচনা চান, তবে নিচে জানাতে পারেন।

রণেশ দাশগুপ্তের 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' প্রবন্ধটি মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ এবং শিল্পীর স্বাধীনতার জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে রচিত একটি আকর গ্রন্থ। প্রবন্ধটিতে লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষের আদিম মেহনত থেকে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে এবং সামাজিক বিবর্তনের মধ্য

দিয়ে তা আজকের বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক ধারায় বিভক্ত হয়েছে।
আপনার বোঝার সুবিধার্থে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য ও দর্শন নিচে সহজভাবে ও কাঠামোগত উপায়ে আলোচনা করা হলো:

১. সাহিত্যের সংজ্ঞা ও শিল্পকলার স্বরূপ

প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক শিল্পী ও সাহিত্যের একটি সহজ অথচ গভীর সংজ্ঞা নির্মাণ করেছেন।

- **শিল্পী কে?:** পটুয়া, গায়ক, নর্তক, কবি বা অভিনেতা—সবাই তাদের নিজস্ব মাধ্যমে (রঙে, সুরে, অক্ষরে বা মুদ্রায়) মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও মানবিক প্রবৃত্তিকে নাড়া দেন।
- **শব্দ ও পদবিন্যাসের শিল্পকলা:** সাহিত্য হলো মূলত শব্দ বা ভাষার শিল্পকলা। একজন সাহিত্যিক প্রধানত শব্দশিল্পী।
- **শিল্পকলার সমন্বয়:** সাহিত্য অন্যান্য শিল্পকলাকে (যেমন সঙ্গীত বা স্থাপত্য) নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে। যেমন—রোমাঁ রলাঁর উপন্যাসে সুরের আস্বাদ বা সিনক্লেয়ার লুইসের উপন্যাসে স্থাপত্যের কাঠামো পাওয়া যায়।

২. সামাজিক বিবর্তন, শ্রমবিভাগ ও চেতনার ত্রিধারা

রণেশ দাশগুপ্তের মতে, আদিম যুগে মানুষ যখন প্রকৃতি থেকে আলাদা হলো, তখন তার প্রধান হাতিয়ার ছিল দুটি: জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার এবং মনন বা চেতনা। এই চেতনার তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে:

- **শিল্পকলা (আবেগপ্রধান):** মানুষ তার কামনা-বাসনা ও অনুভূতির স্বাক্ষর প্রকৃতির ওপর এঁকে দেয় (যেমন—বাঁশের টুকরো হয়ে ওঠে বাঁশি)।
- **বিজ্ঞান (নিস্পৃহ ও অনাসক্ত):** প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলিকে জানা এবং তার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলানো।
- **ভাবাদর্শ বা দর্শন (সর্বগ্রাহী):** সমাজ, ব্যক্তি ও প্রকৃতির সামগ্রিক তত্ত্বের সমন্বয়।

শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণীশাসিত সমাজ

আদিম সাম্যবাদী সমাজে সবাই মেহনত করত এবং সবাই শিল্পী ছিল, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেয়ে যৌথ চেতনাই প্রধান ছিল। কিন্তু সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দাসপ্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজ শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়।
এর ফলে একটি মারাত্মক রূপান্তর ঘটে: সমাজের মনন বা চেতনার জিম্মাদারি চলে যায় মালিক বা পরিচালক শ্রেণীর হাতে, আর মেহনতের ভার পড়ে শ্রমিক বা শোষিত শ্রেণীর ওপর।

৩. ধনিকতন্ত্র (পুঁজিবাদ) ও শিল্পীর স্বাধীনতা

লেখক এই প্রবন্ধে পুঁজিবাদী বা ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কেন ধনিকতন্ত্র শিল্পীর প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারে না।

- **আবেদনহীনতা:** ধনিকতন্ত্র অনেক আগেই শিল্পীদের কাছে তার আত্মিক আবেদন হারিয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে শিল্পীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।
- **বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত:** প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পেছনে ছিল পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী ও মুনাফাখোরী মনোভাব, যা মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে চূর্ণ করে দিয়েছে।
- **পাশ্চাত্য সাহিত্যের উদাহরণ:** জ্যাক লন্ডন, থিওডোর ড্রাইজার, সিনক্লেয়ার লুইস, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, ডি. এইচ. লরেন্সের মতো মহান লেখকেরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভেতরে থেকেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছেন।

৪. সমাজতন্ত্র ও শিল্পীর মুক্তি

প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হলো—একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমেই শিল্পীর স্বাধীনতার প্রকৃত সমাধান সম্ভব।

- **যৌথতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুসঙ্গতি:** সমাজতন্ত্র মানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি নয়। অস্কার ওয়াইল্ড বা ক্রিস্টফার

কডওয়েলের সূত্র ধরে লেখক দেখিয়েছেন, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটলে ব্যক্তিকতা আরও প্রমুক্ত, মার্জিত ও ঘনীভূত হয়।
- ঐকিক ও যৌগিক সত্তা: সমাজতন্ত্রী শিল্পী একদিকে যেমন সমাজের বা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ (যৌথ সত্তা), অন্যদিকে তিনি নিজের সৃষ্টিতে স্বাধীন ও অনন্য (ব্যক্তিক সত্তা)।

সোভিয়েত শিল্পীদের দৃষ্টান্ত

লেখক তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করতে বেশ কয়েকজন কালজয়ী সোভিয়েত শিল্পীর উদাহরণ দিয়েছেন:
- **ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি:** যিনি চেয়েছিলেন কবিতার উৎপাদনকেও রাষ্ট্রীয় লোহা-লক্কড় বা শিল্পায়নের সমকক্ষ গুরুত্ব দেওয়া হোক।
- **ম্যাক্সিম গোর্কি ও কন্সতান্তিন পস্তভস্কি:** যাঁরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার পাশাপাশি শিল্পীর ব্যক্তিগত সৃজনশৈলী ও বিবেকের স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন।
- **স্তানিসলাভস্কি (থিয়েটার), আইসেনস্টাইন (চলচ্চিত্র) ও শস্তাকোভিচ (সঙ্গীত):** এরা সবাই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে তীব্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নিজস্ব শিল্প স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন।

৫. সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ (Socialist Realism)

কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রিডরিশ এঙ্গেলসের চিন্তাধারা থেকে এই সামগ্রিক নন্দনতত্ত্বের জন্ম। লেখক একে সাহিত্যের সর্বাধুনিক ও সামগ্রিক সংজ্ঞা বলেছেন।
এটি এমন এক শিল্পাদর্শ যেখানে:
- চেতনা ও মেহনতের অবাধ মিলন ঘটে।
- সাহিত্য আর কোনো নির্দিষ্ট সুবিধাভোগী শ্রেণীর একক সম্পত্তি থাকে না, বরং তা সমগ্র মেহনতি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার দর্পণ হয়ে ওঠে।
- অতীত ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলোকে গ্রহণ করে ভবিষ্যতের এক শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখানো হয়।

সারসংক্ষেপ

রণেশ দাশগুপ্তের এই প্রবন্ধের মূল সুর হলো—শিল্পীর স্বাধীনতা কোনো শূন্যস্থানে বা সমাজবিচ্ছিন্ন অবাস্তব জগতে অর্জিত হতে পারে না। পুঁজিবাদ শিল্পীকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে আসলে একাকী ও বিভ্রান্ত করে। পক্ষান্তরে, সমাজতন্ত্র সমাজকে রূপান্তরের যে যৌথ মেহনত বা সংগ্রাম, তার অংশীদার হিসেবে শিল্পীকে এক বৃহত্তর ও সার্থক স্বাধীনতার দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়। শিল্পীর স্বাধীনতা তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তার ব্যক্তিক সৃজনশীলতা সমগ্র মানবসমাজের মুক্তির তাগিদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

রণেশ দাশগুপ্তের 'আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত' প্রবন্ধটির আরও গভীরে গিয়ে এর প্রতিটি তাত্ত্বিক দিক, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং কাঠামোগত বিন্যাস নিচে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. শিল্পীচিত্তের দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি: অন্তর্জগত বনাম বহিজগত

রণেশ দাশগুপ্ত মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের (Dialectical Materialism) আলোকেই শিল্পীচিত্তের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, একজন শিল্পীর মনে প্রতিনিয়ত দুটি জগতের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় চলে:
- **ব্যক্তিগত অনুভূতি (অন্তর্জগত):** শিল্পীর নিজস্ব সুখ, দুঃখ, একাকীত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা।
- **সামাজিক বাস্তবতা (বহিজগত):** চারপাশের মানুষের দারিদ্র্য, শ্রেণীসংগ্রাম, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ইতিহাসের গতিধারা।

আকর্ষণের মেকানিজম: লেখক দেখিয়েছেন, অনুন্নত বা বুর্জোয়া মানসিকতার শিল্পীরা কেবল অন্তর্জগতে বুঁদ হয়ে থাকেন।

কিন্তু যখন একজন শিল্পীর চিত্ত প্রগতিশীল চেতনায় দীক্ষিত হয়, তখন তার অন্তর্জগত বহির্জগতের মহান আন্দোলন ও মেহনতি মানুষের কান্নার প্রতি 'আকর্ষিত' হয়। এই আকর্ষণ কোনো কৃত্রিম চাপ নয়, বরং এটি শিল্পীর ভেতরের এক অনিবার্য আত্মিক তাগিদ।

২. ‘শিল্পের জন্য শিল্প’ (Art for Art's Sake) তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ

প্রবন্ধটিতে লেখক অত্যন্ত কঠোরভাবে বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের একটি জনপ্রিয় ধারণাকে খণ্ডন করেছেন, যা হলো—“শিল্প কেবল আনন্দের জন্য, তার কোনো সামাজিক দায় নেই।”
দাশগুপ্ত যুক্তি দিয়েছেন:

- শিল্পকে সমাজ থেকে আলাদা করার অর্থ হলো শিল্পকে এক ধরণের "বিলাসিতা" বা "পণ্য" বানিয়ে ফেলা।
- পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা চায় শিল্পী যেন সমাজবিচ্ছিন্ন থাকে, যাতে সে শোষণের বিরুদ্ধে কলম না ধরে।
- কিন্তু খাঁটি ‘শিল্পীচিত্ত’ কখনোই এই জাদুকরী খাঁচায় বন্দি থাকতে পারে না। মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামই শিল্পীর তুলি বা কলমকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে।

৩. শ্রমের নন্দনতত্ত্ব ও সংস্কৃতির উৎস

প্রবন্ধের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মানুষের আদিম মেহনত বা শ্রমের সাথে শিল্পীর আকর্ষণের সম্পর্ক। রণেশ দাশগুপ্তের মতে:

- মানুষের প্রথম সৃজনশীলতা প্রকাশ পেয়েছিল শ্রমের মাধ্যমে—যখন সে পাথর কেটে হাতিয়ার বানাত বা মাটি দিয়ে পাত্র তৈরি করত।
- মেহনতের এই আদিম স্পন্দনই সংস্কৃতির মূল ভিত্তি।
- একজন প্রগতিশীল শিল্পীর চিত্ত তাই প্রাকৃতিকভাবেই সেইসব মানুষের প্রতি আকর্ষিত হয় যারা আজো মাঠে-ঘাটে, কল-কারখানায় মেহনত করে সভ্যতাকে টিকিয়ে রেখেছে। শ্রমজীবী মানুষের ঘাম ও রক্ত বিন্দুর মধ্যেই শিল্পী আসল সৌন্দর্যের সন্ধান পান।

৪. ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ-প্রীতি (Prophetic Vision)

আকর্ষিত শিল্পীচিত্তের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—তা কেবল বর্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। লেখক এর তিনটি কালগত মাত্রার কথা বলেছেন:

- অতীতের প্রতি আকর্ষণ: ইতিহাসের প্রগতিশীল ধারা, গণবিদ্রোহ এবং লোক-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে শিল্পী গভীরভাবে উপলব্ধি করেন।
- বর্তমানের প্রতি আকর্ষণ: বর্তমানের শ্রেণীসংগ্রাম, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং মানুষের ভেতরের মানবিক স্ফুলিঙ্গকে তিনি ধারণ করেন।
- ভবিষ্যতের প্রতি আকর্ষণ: শিল্পী হলেন দূরদ্রষ্টা। এক শোষণমুক্ত, সাম্যবাদী ও মানবিক পৃথিবীর যে রূপরেখা ভবিষ্যতে লুকিয়ে আছে, তা শিল্পীর চিত্তকে প্রবলভাবে টানে। এই আকর্ষণই তাকে চরম সংকটের মুখেও আশাবাদী সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. প্রগতি লেখক সংঘ ও বাস্তব প্রেক্ষাপট

রণেশ দাশগুপ্ত নিজে বাংলাদেশে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের (যেমন: প্রগতি লেখক সংঘ) অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁর সেই সাংগঠনিক ও আদর্শিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে:

- ৩০ ও ৪০-এর দশকের দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন যেভাবে বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের (যেমন: সুকান্ত ভট্টাচার্য, সোমেন চন্দ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) ঘর থেকে বের করে এনেছিল, লেখক সেই বাস্তবতাকে তাত্ত্বিক রূপ দিয়েছেন।
- তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, যখন চারপাশের পরিপার্শ্ব উত্তাল থাকে, তখন সংবেদনশীল শিল্পীচিত্ত ঘরে বসে ‘চাঁদ-ফুল-পাখি’ নিয়ে কাব্যবিলাস করতে পারে না; তা গণমানুষের মিছিলে আকর্ষিত হতে বাধ্য।

প্রবন্ধের মূল সিদ্ধান্ত (Conclusion)

রণেশ দাশগুপ্তের 'আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত' কেবল একটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধ নয়, এটি শিল্পীদের জন্য একটি ইশতেহার (Manifesto)। প্রবন্ধের শেষ কথা এটাই যে—শিল্পীর স্বাধীনতা বা সার্থকতা বিচ্ছিন্নতায় নেই, তা রয়েছে মানুষের সাথে একাত্মতার মধ্যে। যে শিল্পীচিত্ত সাম্য, মানবতা এবং শোষিত মানুষের মুক্তির অমোঘ সত্যের প্রতি আকর্ষিত হতে পেরেছে, সেই চিত্ত থেকে জন্ম নেওয়া শিল্পই কেবল কালজয়ী ও অপরাজেয় হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে।
রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্বে বিশ্ববিশ্রুত এবং দেশীয় বহু কালজয়ী চিন্তাবিদ ও শিল্পীদের জীবন, দর্শন ও মতামত অত্যন্ত নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। লেখক মূলত তাঁর প্রগতিশীল মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বকে জোরালো করতে এবং শিল্পীচিত্তের দায়বদ্ধতা ও রূপান্তরকে প্রমাণ করতে এই মহান ব্যক্তিত্বদের উদাহরণ ও মতামত টেনেছেন।
নিচে প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে আসা এবং রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য দর্শনে প্রতিফলিত প্রধান বিখ্যাত ব্যক্তিদের আলোচনা, অবদান এবং তাঁদের নিজস্ব মতামতসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

১. কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস (Friedrich Engels)

- **পরিচয় ও গুরুত্ব:** বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও মার্ক্সবাদের জনক। রণেশ দাশগুপ্তের পুরো প্রবন্ধের মূল ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের দর্শনের ওপর।
- **তাঁদের মতামত ও তত্ত্ব:**
    - মার্ক্স ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ও উৎপাদন ব্যবস্থার (Base) ওপর ভিত্তি করেই তার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের (Superstructure) জন্ম হয়।
    - আদিম সাম্যবাদী সমাজে মেহনত এবং চেতনার কোনো বিভেদ ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্মের পর যে শ্রেণীবিভাগ তৈরি হলো, তা শিল্প ও সংস্কৃতির জিম্মাদারি তুলে দিল শাসক বা পরিচালক শ্রেণীর হাতে।
    - তাঁদের মতে, শিল্পীর প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা কেবল তখনই সম্ভব, যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে মানবসমাজ আবার শ্রেণীহীন অবস্থায় পৌঁছাবে এবং শিল্প কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর সম্পত্তি না হয়ে সমগ্র জনগণের সম্পত্তি হবে।

২. ম্যাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky)

- **পরিচয় ও গুরুত্ব:** রুশ সাহিত্যের কালজয়ী কথাসাহিত্যিক এবং 'সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ' (Socialist Realism)-এর অন্যতম প্রবক্তা।
- **তাঁর মতামত ও অবদান:**
    - গোর্কির মতে, সাহিত্যকে হতে হবে মেহনতি মানুষের জাগরণের হাতিয়ার। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মা' *(Mother)* এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
    - তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন শিল্পীর চিত্তকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করা উচিত সাধারণ মানুষের শ্রম এবং তাদের অপরাজেয় জীবনসংগ্রাম।
    - সোভিয়েত লেখক সংঘের প্রথম কংগ্রেসে তিনি দলবদ্ধ যৌথ কাজের পাশাপাশি শিল্পীর নিজস্ব বিবেক ও সৃজনশীলতার স্বাধীনতার পক্ষেও জোরালো মত দিয়েছিলেন।

৩. ভ্লাদিমির মায়াকোভস্কি (Vladimir Mayakovsky)

- **পরিচয় ও গুরুত্ব:** রুশ বিপ্লবের মহান চারণকবি এবং প্রগতিশীল কবি-আন্দোলনের পুরোধা।
- **তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি:**
    - মায়াকোভস্কি মনে করতেন, কবি বা শিল্পীর কাজ ড্রয়িংরুমে বসে কাব্যচর্চা করা নয়; বরং কবিতার শব্দগুলোকে হতে হবে বিপ্লবের বুলেটের মতো শক্তিশালী।
    - তিনি দাবি করেছিলেন, রাষ্ট্রের লোহা-লক্কড় বা ভারী শিল্প উৎপাদনের মতো কবিতার উৎপাদনকেও সমকক্ষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর বিপ্লবী শিল্পীচিত্ত সোভিয়েত সমাজ গঠনের প্রতিটি ধাপে শ্রমিকদের সাথে

একাত্ম হয়ে কাজ করার জন্য আকর্ষিত হয়েছিল।

৪. অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde)

- **পরিচয় ও গুরুত্ব:** বিখ্যাত আইরিশ কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক।
- **তাঁর মতামত ও প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিকতা:**
    - অস্কার ওয়াইল্ডকে সাধারণত 'শিল্পের জন্য শিল্প' (Art for Art's sake) আন্দোলনের মানুষ মনে করা হলেও, তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ রয়েছে—*'The Soul of Man under Socialism'* (সমাজতন্ত্রে মানুষের আত্মা)।
    - রণেশ দাশগুপ্ত অস্কার ওয়াইল্ডের এই সূত্রটি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজতন্ত্রে ধ্বংস হয় না। ওয়াইল্ডের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ সম্পত্তির পেছনে ছুটতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, তখন মানুষের ব্যক্তিকতা ও শিল্পীর সৃজনশীল সত্তা আরও প্রমুক্ত ও মার্জিত হয়ে বিকশিত হবে।

৫. ক্রিস্টফার কডওয়েল (Christopher Caudwell)

- **পরিচয় ও গুরুত্ব:** ব্রিটিশ মার্ক্সীয় নন্দনতাত্ত্বিক, কবি ও সমালোচক, যিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে শহীদ হন।
- **তাঁর মতামত ও তত্ত্ব:**
    - কডওয়েল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'Illusion and Reality'* (ভ্রম ও বাস্তবতা)-তে দেখিয়েছেন কীভাবে আদিম মানুষের যৌথ শ্রম ও উৎসব থেকে কবিতার জন্ম হয়েছিল।
    - তাঁর মতে, বুর্জোয়া সমাজে শিল্পীর 'স্বাধীনতার' ধারণা একটি বিভ্রম (Illusion)। পুঁজিবাদ শিল্পীকে সমাজবিচ্ছিন্ন করে এক ধরণের মেকি স্বাধীনতা দেয়। প্রকৃত স্বাধীনতা আসে সমাজের বাস্তব রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে। রণেশ দাশগুপ্ত কডওয়েলের এই দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণকে গভীরভাবে ধারণ করেছেন।

৬. রোমাঁ রলাঁ (Romain Rolland)

- **পরিচয় ও গুরুত্ব:** নোবেলজয়ী ফরাসি ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার, যিনি বিশ্বশান্তি ও প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর ছিলেন।
- **তাঁর মতামত ও উদাহরণ:**
    - রোমাঁ রলাঁ বিশ্বাস করতেন, শিল্পীর সৃষ্টিতে মানবতাবোধের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে। তিনি বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।
    - তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *'জঁ ক্রিস্তফ' (Jean-Christophe)*-এর কথা উল্লেখ করে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে সাহিত্যের ভেতরে সঙ্গীত বা সুরের মহাজাগতিক আবেদনকে অঙ্গীভূত করা যায়, যা শিল্পীর প্রসারিত চিত্তেরই প্রমাণ।

৭. কনস্তান্তিন পস্তভস্কি (Konstantin Paustovsky)

- **পরিচয় ও গুরুত্ব:** প্রখ্যাত সোভিয়েত রুশ লেখক, যিনি তাঁর স্মৃতিকথামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক লেখার জন্য বিখ্যাত।
- **তাঁর মতামত:**
    - পস্তভস্কি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও শিল্পীর অন্তর্জগৎ, কল্পনাপ্রবণতা এবং রোমান্টিক চেতনার স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছেন।
    - তিনি মনে করতেন, সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ মানে যান্ত্রিকভাবে শুধু কল-কারখানার বিবরণ দেওয়া নয়, বরং মানুষের মনের গভীরতম মানবিক ও রোমান্টিক দিকগুলোকে ফুটিয়ে তোলা। শিল্পীর চিত্ত এই সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তির প্রতিও সমানভাবে আকর্ষিত হয়।

৮. থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের মহানায়কেরা (স্তানিসলাভস্কি, আইসেনস্টাইন, শস্তাকোভিচ)

- কন্সতান্তিন স্তানিসলাভস্কি **(Stanislavski):** নাট্যতত্ত্বের প্রবাদপুরুষ। তাঁর মতামত ছিল যে, একজন অভিনেতাকে চরিত্রের ভেতরে প্রবেশ করতে হলে বাস্তব জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি নাট্যকলার এক অভূতপূর্ব বাস্তববাদী রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন।
- সের্গেই আইসেনস্টাইন **(Sergei Eisenstein):** কালজয়ী চলচ্চিত্র পরিচালক (যেমন: *Battleship Potemkin*)। তিনি তাঁর 'মঁতাজ' (Montage) তত্ত্বের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে চলচ্চিত্রের ফ্রেমের দ্বন্দ্ব দিয়ে দর্শকের মনে বিপ্লবী চেতনার জন্ম দেওয়া যায়। তাঁর শিল্পীচিত্ত ইতিহাসের মহান গণঅভ্যুত্থানের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল।
- দিমিত্রি শস্তাকোভিচ **(Dmitri Shostakovich):** বিখ্যাত সোভিয়েত সঙ্গীতস্রষ্টা। তিনি সিমফোনির সুরে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধকে অমর করে রেখেছেন।

সারসংক্ষেপ: রণেশ দাশগুপ্তের চোখে এই ব্যক্তিত্বদের মেলবন্ধন

রণেশ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত মহান ব্যক্তিদের দেশ, কাল বা মাধ্যম (কবিতা, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত) ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাঁদের 'শিল্পীচিত্ত' এক জায়গায় এসে মিলে গেছে। তাঁরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে—ব্যক্তিগত অহংকার বা বুর্জোয়া মরীচিকার পেছনে না ছুটে, মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক রূপান্তর এবং শোষিত মানুষের মুক্তির অমোঘ সত্যের প্রতি আকর্ষিত হওয়াই একজন খাঁটি শিল্পীর একমাত্র নিয়তি।

রণেশ দাশগুপ্তের মননশীল ও প্রগতিশীল প্রবন্ধ **'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে'**-এর মূল প্রতিপাদ্যই হলো সাহিত্য ও শিল্পের সাথে মানুষের সামাজিক, **ঐতিহাসিক** এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন করা। এই প্রবন্ধের গভীরতর বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, শিল্পবিচারে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব কোনো খণ্ডিত বা একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বরং তা জীবনের বহুমাত্রিক সত্যকে ধারণ করে একটি সামগ্রিক রূপ পরিগ্রহ করে।
প্রবন্ধের প্রারম্ভেই রণেশ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, সাহিত্য বা শিল্পকলা কোনো শূন্য থেকে ভেসে আসা দৈববাণী বা আকাশকুসুম কল্পনা নয়। আদিম মানব-সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষ মনন ও জীবিকা অর্জনের হাতিয়ারের সাহায্যে নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে আলাদা করেছে। মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে, মানুষের এই সক্রিয় মেহনত ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর ঘটে এবং তারই ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত হয় মানুষের প্রবৃত্তি, আবেগ ও শিল্পকলার রূপ। সাহিত্য মূলত শব্দ ও পদবিন্যাসের শিল্প হলেও এর উৎস যে সামাজিক পরিবেশ ও মানুষের জীবনসংগ্রাম—মার্কসীয় তত্ত্ব তা সামগ্রিকভাবে প্রমাণ করে।
মার্কসীয় শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে লেখক আরও দেখিয়েছেন যে, আদিম যৌথ-সমাজ ভেঙে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দাসপ্রথার প্রবর্তন হলো, তখন সমাজ শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে মনন বা চেতনার জিম্মাদারি চলে যায় শাসক বা মালিক শ্রেণীর হাতে এবং মেহনতী মানুষ পরিণত হয় নিছক শ্রমযন্ত্রে। সাহিত্যের ইতিহাসেও এই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের প্রতিফলন সমান্তরালভাবে চলেছে। একপক্ষে থাকে বিদগ্ধ, সূক্ষ্ম ও ঐতিহ্যের পাকা অলঙ্কার, অন্যপক্ষে থাকে মেহনতের ধুলোবালি ও সাধারণ মানুষের আকুতি। মার্কসীয় তত্ত্ব সাহিত্যের এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আপাত-বৈপরীত্যকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে না দেখে ইতিহাসের এক সামগ্রিক পটভূমিতে বিচার করে।
ইতিহাসে অলঙ্কারবাদ, অ্যারিস্টটলের ক্যাথারসিস বা আবেগের পরিশোধন, কিংবা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের 'শিল্পের জন্য শিল্প' বা রূপবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মতো নানাবিধ আংশিক ও একদেশদর্শী সাহিত্যের সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল। ফরাসি মনস্তত্ত্ববাদী লেখক বা আধুনিক বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের সংজ্ঞাগুলো মানুষের জীবনকে খণ্ডিতভাবে বিচার করে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'চিরন্তন নিত্যস্বভাব' কিংবা অন্য তাত্ত্বিকদের চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সীমাবদ্ধতাও মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কসীয় তত্ত্ব সাহিত্যকে কেবল মধু বা ভ্রমরগুঞ্জনের মতো খণ্ডিত আনন্দের উপাদান হিসেবে দেখে না। বরং মানুষের মনন, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ এবং মেহনতের সামগ্রিক যোগাযোগের সূত্রকে উন্মোচন করে সাহিত্যকে এক সর্বাত্মক ও অখণ্ড রূপ দান করে।
'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' প্রবন্ধের আলোকে মার্কসীয় শিল্পবিচারের চূড়ান্ত সার্থকতা প্রকাশ পায় 'সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ'-এর সংজ্ঞায়। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের মাধ্যমে মেহনতী মানুষের যে নবজাগরণ ঘটেছে, তা সাহিত্যকে খণ্ডিত বা শৃঙ্খলিত রূপ থেকে মুক্ত করে এক পূর্ণাঙ্গ সামগ্রিকতা

দান করেছে। এখানে যৌথসত্তা বা সামাজিক সংহতি এবং ব্যক্তিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কোনো কৃত্রিম প্রাচীর থাকে না। মায়াকভস্কি বা ম্যাক্সিম গোর্কির মতো সাহিত্যিকদের লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ জগতকে তার সামগ্রিক গতিশীলতায় ও পরিবর্তনের দ্বন্দ্বে অবলোকন করতে শেখায়।
পরিশেষে বলা যায়, রণেশ দাশগুপ্তের আলোচনা অনুসারে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব সাহিত্যকে সমাজ, ইতিহাস, অর্থনীতি বা মানুষের মনস্তত্ত্বের কোনো একটি বিচ্ছিন্ন উপাদান দিয়ে পরিমাপ করে না। বরং এটি উৎপাদন পদ্ধতি থেকে শুরু করে ভাবাদর্শের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মানব-অভিজ্ঞতার সমস্ত সূক্ষ্ম ও স্থূল দিককে একসূত্রে গ্রথিত করে। তাই পরীক্ষার খাতায় উত্তর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বলা চলে, সাহিত্যের আলোচনা ও শিল্পবিচারে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সর্বাত্মক ও সমগ্রতাস্পর্শী।

রণেশ দাশগুপ্তের 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' (১৯৬৬) গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসে একটি মাইলফলক (source: 1.2.4)। সাম্যবাদী আদর্শে আজীবন বিশ্বাসী রণেশ দাশগুপ্ত এই গ্রন্থে মার্কসবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কষ্টিপাথরে সাহিত্য, শিল্পকলা এবং শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে বিচার করেছেন। তবে তিনি অন্ধ বা কেতাবী তত্ত্বানুগত্য (Dogmatism) করেননি; বরং মানবিকতা, নান্দনিকতা ও সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার সমন্বয়ে তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবনার এক অনন্য রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন (source: 1.2.8)। [1, 2]

'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' গ্রন্থের আলোকে সাহিত্য-সমালোচনায় রণেশ দাশগুপ্তের সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রধান দিকগুলো নিচে বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

১. সাহিত্যের শ্রেণীগত বিভাজন ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-সমালোচনার মূল স্তম্ভ হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজ যখন শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, তখন সাহিত্যও খণ্ডিত হতে বাধ্য। শ্রেণী সমাজের প্রচলিত সাহিত্যধারা ও সংজ্ঞাকে তিনি একদেশদর্শী বা আংশিক বলে চিহ্নিত করেছেন: [2]

"শ্রেণি সমাজের সাহিত্য চেতনা একদিকে এক চেটিয়া, অন্যদিকে মেহনতের ভার। একদিকে ভাব, অন্যদিকে অভাব—একদিকে অমৃত, অন্যদিকে গরল। শ্রেণী সমাজের সাহিত্য সংজ্ঞা একদেশদর্শী না হয়ে পারে? সংজ্ঞা দেবার অধিকারীও তো অবনত শ্রেণীগুলির চৌহদ্দির মধ্যে ছিল না।" [3]

তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ধনিকতান্ত্রিক সমাজ জ্ঞান ও চেতনাকে নিজেদের 'বালাখানায়' একচেটিয়া দখল করে রাখে এবং মেহনতি মানুষের লোকায়ত সাহিত্যকে বর্জন বা অবজ্ঞা করে।

২. ধনিকতন্ত্রের অসারতা ও শিল্পীর স্বাধীনতা

প্রবন্ধকারের মতে, ধনিকতন্ত্র বা পুঁজিবাদ বিংশ শতাব্দীতে এসে শিল্পীর বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ধনিকতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মুনাফা, ব্যক্তিকতা বা শিল্পীর প্রকৃত রূপ সেখানে হারিয়ে গেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, উনিশ ও বিশ শতকের কালজয়ী বিশ্বশিল্পীরা (যেমন—ভ্যান গগ, টলস্টয়, হেমিংওয়ে, জ্যাক লন্ডন, মায়াকভস্কি) সবাই ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করে সাম্যবাদের দিকে উন্মুখ হয়েছিলেন। তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা স্পষ্ট করে যে, ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থা শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে ছদ্মবেশী এবং এটি মূলত ফ্যাসিবাদের জন্মদাতা, যা শিল্পীর কণ্ঠরোধ করে (source: 1.1.1, 40)।

৩. মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ এবং 'সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ'

রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-সমালোচনার মূল লক্ষ্য হলো—মানুষের সামগ্রিক 'মুক্তি'। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজেই কেবল শিল্পী পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন, আর সে মুক্ত সমাজ দিতে পারে কেবল সমাজতন্ত্র। তিনি 'সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ' (Socialist Realism)-কে সাহিত্যের সার্থক ও সামগ্রিক সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মিখাইল শলোকভের উক্তি টেনে তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ কোনো যান্ত্রিক সূত্র নয়, এটি হলো জনগণের

দ্বারা "নতুন জগৎ গড়ে তোলার কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার" ললিতকলা। [3, 4]

৪. যান্ত্রিকতা ও আমলাতন্ত্রের (Bureaucracy) কড়া সমালোচনা

রণেশ দাশগুপ্তের সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি সমাজতন্ত্রের ভেতরের যান্ত্রিকতা ও ফতোয়াবাজির কড়া সমালোচক ছিলেন। তিনি মনে করতেন, শিল্প সৃষ্টি হয় মানুষের এক বন্য ও নিয়ন্ত্রণবিরোধী দিক থেকে। তাই হুকুমনবীশ বা আমলাদের (Bureaucrats) সুশৃঙ্খল নিয়মে যদি শিল্পীর মনকে শৃঙ্খলিত করা হয়, তবে তা শিল্পের জন্য হবে ধ্বংসাত্মক: [2]

"যে রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র স্বতোৎসারিত ও মুক্ত চিত্তকে নিয়মের নিগড়ে বাঁধে, তার চাইতে শত ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও নৈরাজ্যবাদী সমাজ ভাল।"

তিনি পস্টস্কির 'সোনার গোলাপ' কিংবা সুরকার শোসটাকোভিচের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শিল্পীর নিজস্বতা, ব্যক্তিক শিল্পশৈলী এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতা থাকা অপরিহার্য। সাহিত্যের ওপর জোরপূর্বক রাজনৈতিক প্রচার বা 'গলাবাজি' চাপিয়ে দিলে তা সূত্রানুযায়ী খারাপ রুচির লেখায় পরিণত হয়।

৫. মানবীয় ঐতিহ্য ও বিমূর্ত রূপকল্পনার সহাবস্থান

রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-সমালোচনা পদ্ধতি অন্ধ তত্ত্ববাদী ছিল না (source: 1.2.8)। তিনি মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে 'মানবীয় ঐতিহ্য' হিসেবে সাদরে গ্রহণ করে নতুনের সাথে মিলিয়ে দেয়। তিনি বুর্জোয়া বা ধনিকতন্ত্রী প্ররোচনাকে বর্জন করলেও, পাবলো পিকাসো, ভ্যান গগ বা চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের 'বিমূর্ত' বা 'প্রতিরূপ-লক্ষ্মী' আধুনিক চিত্রকলাকে বাতিল করেননি। তাঁর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা অনুযায়ী, এই বিমূর্ত রূপসৃষ্টির ভেতরেও জনগণের সংগ্রামী চেতনা ও লোকশিল্পের আদিম প্রাণপ্রাচুর্য মিশে থাকে। [1, 5]

সারসংক্ষেপ:
সাহিত্য-সমালোচনায় রণেশ দাশগুপ্তের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ছিল অত্যন্ত উদার, গভীর এবং মানবতাবাদী (source: 1.1.1)। তিনি সাহিত্যকে মেহনতি মানুষের অধিকার ও সমাজ-বাস্তবতার দর্পণ হিসেবে বিচার করেছেন, কিন্তু একই সাথে শিল্পীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কল্পনার মায়ালোক এবং যান্ত্রিকতামুক্ত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমাজতন্ত্রের প্রধান শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। [2, 3]

রণেশ দাশগুপ্তের 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তিই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে শিল্প-সাহিত্যের বিচার। প্রাবন্ধিক তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, শিল্পকে যখন কেবল অলংকার, ভাব বা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক কল্পনা হিসেবে দেখা হয়, তখন তা আংশিক বা একদেশদর্শী রূপ নেয়। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটালে শিল্পের আলোচনা সমাজ, অর্থনীতি, ইতিহাস এবং মেহনতি মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার সাথে যুক্ত হয়ে 'সমগ্রতাস্পর্শী' বা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে।

'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে' গ্রন্থের আলোকে এই বক্তব্যের যাথার্থ্য নিচে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্টের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. শিল্প ও সংস্কৃতির বস্তুগত ভিত্তি (Material Base)

ফাইল অনুযায়ী, মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে শিল্পকে বুঝতে হলে তা আকাশ থেকে পড়া কোনো দৈববাণী বা বিচ্ছিন্ন প্রেরণা নয়; বরং মানুষের বস্তুগত শ্রম বা মেহনতের ফসল। প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন, মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদে তৈরি করা জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার এবং তার কায়িক শ্রমের মধ্য দিয়েই মনন বা চেতনার জন্ম হয়েছে। রণেশ দাশগুপ্তের ভাষায়—"মেহনত সকল সংস্কৃতির জাদুদণ্ড। শিল্পকলা এবং সাহিত্যেরও।" অর্থাৎ, শিল্পের নান্দনিক রূপটি যে সমাজের অর্থনৈতিক উৎপাদন কাঠামোর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, মার্কসীয় তত্ত্বের এই প্রয়োগই শিল্পের আলোচনাকে প্রথম

খণ্ডিতাংশ থেকে মুক্ত করে সামগ্রিকতা দেয়।

২. ‘সামাজিক চশমা’ ও প্রকৃতির রূপান্তর

মানুষ প্রকৃতিকে কীভাবে দেখে এবং শিল্পে তাকে কীভাবে রূপ দেয়, তার ব্যাখ্যায় মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক ক্রিস্টফার কডওয়েলের একটি বিখ্যাত উক্তি প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে—"প্রকৃতিকে মানুষ দেখে সামাজিক চশমা দিয়ে।" অন্য সব প্রাণী প্রকৃতির ডাকে সরাসরি সাড়া দিলেও, মানুষের সাথে প্রকৃতির যোগাযোগ ঘটে ‘অর্থনৈতিক সমাজ মারফত’। মানুষের আবেগ, কামনা-বাসনা ও শিল্পসৃষ্টি তাই সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। মার্কসীয় তত্ত্বের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শিল্পীর কল্পনা আর বায়বীয় থাকে না, বরং তা বাস্তব পৃথিবীর সামগ্রিক রূপান্তরের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

৩. শ্রেণী সমাজ ও শিল্পের খণ্ডিত রূপের উন্মোচন

রণেশ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ‘শ্রম বিভাগ’ (Division of Labor) তৈরি হলো, তখন সমাজ শোষক ও শোষিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর ফলে শাসকশ্রেণী উৎপাদনের উপায়ের পাশাপাশি ‘মনন’ বা ‘চেতনার’ একচেটিয়া জিম্মাদার হয়ে বসল। মার্কসীয় তত্ত্ব এখানে প্রয়োগ করে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন কীভাবে সাহিত্যও তখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়—একদিকে উচ্চবিত্তের জন্য ‘সাহিত্য দর্পণ’ বা ‘গীতগোবিন্দ’, অন্যদিকে শোষিত জনগণের ‘ডাকের বচন’ বা ‘শূন্য পুরাণ’। এই শ্রেণীগত বিভাজন ও শিল্পের ওপর তার প্রভাবকে চেনার মাধ্যমেই কেবল সাহিত্যের একটি আংশিক সংজ্ঞাকে 'সমগ্রতাস্পর্শী' সংজ্ঞায় রূপ দেওয়া সম্ভব।

৪. সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ (Socialist Realism) এবং পূর্ণাঙ্গ মুক্তি

প্রবন্ধে মার্কসীয় তত্ত্বের চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হিসেবে ‘সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ’-এর অবতারণা করা হয়েছে। এটি কেবল একটি সাহিত্যিক আঙ্গিক বা ফ্যাশন নয়, বরং সমাজতন্ত্রে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ হয়, তখন শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক ঐতিহাসিক ঐক্য গড়ে ওঠে। এর ফলে শিল্প শোষকশ্রেণীর ফতোয়া, শৃঙ্খল এবং ধনিকতন্ত্রী বাজার ব্যবস্থার মুনাফাভোগী ফাটকাবাজি থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের ‘সমগ্রতা’ লাভ করে। এখানে মনন, প্রকৃতি, সমাজ এবং ব্যক্তি এক সূত্রে গেঁথে যায়। মিখাইল শলোকভের উক্তি টেনে দেখানো হয়েছে যে, সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ হলো "জীবন সত্যের ললিতকলা", যা জনগণকে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে সামগ্রিকভাবে সাহায্য করে।

৫. আধুনিক চিত্রকলার বিমূর্ত রূপের সামগ্রিক মূল্যায়ন

গ্রন্থের ‘আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ’ অধ্যায়েও মার্কসীয় তত্ত্বের এই সমগ্রতাস্পর্শী রূপটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ধনিকতন্ত্রী তাত্ত্বিকরা পাবলো পিকাসো বা ভ্যান গগের বিমূর্ত চিত্রকলাকে ‘গণবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিলাসিতা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ফিনকেলস্টাইন বা হার্বার্ট রীডের উদ্ধৃতি দিয়ে রণেশ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, পিকাসোর ‘গের্নিকা’ ছবির মতো তথাকথিত উদ্ভট ও বিমূর্ত রূপের ভেতরেও মেহনতি মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ও আদিম লোকশিল্পের প্রাণপ্রাচুর্য জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ, একটি দুর্বোধ্য শিল্পকেও তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে যুক্ত করে মার্কসীয় তত্ত্ব তাকে সামগ্রিক ও সর্বজনীন করে তোলে।

উপসংহার:
পরিশেষে বলা যায়, রণেশ দাশগুপ্তের ‘শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে’ গ্রন্থের আলোকে এই উক্তিটি সম্পূর্ণ যথার্থ। শিল্পকে যখন শুধু ব্যক্তিগত খেয়াল বা বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের ফ্রেমে বিচার করা হয়, তখন তা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ শিল্পকে মানুষের কায়িক শ্রম, শ্রেণী সংগ্রাম, সংস্কৃতির ইতিহাস এবং সাম্যবাদী সমাজ গঠনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের সাথে যুক্ত করে তাকে জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ ও ‘সমগ্রতাস্পর্শী’ দর্পণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধগুচ্ছ: মার্ক্সীয় ও বৈজ্ঞানিক

সমাজতান্ত্রিক মূল্যায়ন

ভূমিকা

রণেশ দাশগুপ্ত বাংলা মননশীল ও প্রগতিশীল সাহিত্য-সমালোচনার ধারায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি মার্ক্সীয় দর্শন বা দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Dialectical Historical Materialism)। আলোচ্য চারটি প্রবন্ধের সামগ্রিক অবয়বে তিনি সাহিত্য, সমাজ, শিল্পীর স্বাধীনতা এবং পুঁজিবাদী সংকটের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্য কোনো অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতিক শক্তির দান নয়, বরং মানুষের বস্তুগত জীবনসংগ্রাম ও সামাজিক মেহনতের এক নান্দনিক উপরি-কাঠামো (Superstructure)।

মূলভাব ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (পয়েন্টভিত্তিক)

১. ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং সাহিত্যের বনিয়াদ: শ্রম ও ভাষার ভূমিকা

মার্ক্সীয় দর্শনের প্রথম সূত্র হলো—মানুষের অস্তিত্ব ও চেতনার ভিত্তি তার উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রমের মধ্যে নিহিত। প্রবন্ধকার অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে দেখিয়েছেন যে, মানুষ ও পশুর মৌল পার্থক্য গড়ে উঠেছে জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার এবং মননশীলতার যুগপৎ বিকাশের মাধ্যমে।

- **সামাজিক চশমা ও কৃষ্টি:** প্রখ্যাত মার্ক্সীয় চিন্তাবিদ ক্রিস্টফার কডওয়েলের সূত্র ধরে প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, মানুষ প্রকৃতিকে শূন্য থেকে দেখে না; সে দেখে "সামাজিক চশমা" অর্থাৎ সমাজের সামষ্টিক অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। আদিম মানুষের যৌথ শ্রম, শিকার ও উৎসবের লৌকিক গান থেকেই সংস্কৃতির আদিম রূপান্তর ঘটেছে।
- **ভাষা ও সাহিত্য:** সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম 'ভাষা' কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। মেহনতি মানুষের আদিম পারস্পরিক সাহচর্য এবং যৌথ উৎপাদনের তাগিদেই ভাষার জন্ম ও বিকাশ। সুতরাং, সাহিত্যের আদি বনিয়াদ সম্পূর্ণরূপে বস্তুগত ও সামাজিক।

২. শ্রেণীবিভক্ত সমাজ এবং সাহিত্যের আংশিকতা ও একদেশদর্শিতা

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে যখন দাসপ্রথা ও সামন্তবাদের মতো শ্রেণীসমাজের পত্তন ঘটল, তখন উৎপাদন ব্যবস্থার মতো মানুষের মননজগতেও বিভাজন দেখা দিল।

- **মননের জিম্মাদারি:** শ্রেণীসমাজে কায়িক শ্রম ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম আলাদা হয়ে যায়। মেহনতি মানুষ পরিণত হয় শুধু উৎপাদনের হাতিয়ারে, আর পরজীবী শোষক বা মালিকশ্রেণী হয় সংস্কৃতির জিম্মাদার।
- **সাহিত্যের আংশিক সংজ্ঞা:** বিগত পাঁচ হাজার বছরের অলংকার শাস্ত্র, রসবিচার কিংবা 'সাহিত্য দর্পণ'-এর মতো শাস্ত্রীয় ফতোয়াগুলো শোষক শ্রেণীর রুচি ও স্বার্থ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের লৌকিক জীবন (যেমন: ডাকের বচন বা শূন্য পুরাণ) অবহেলিত রয়ে গেছে এবং সাহিত্যে আধ্যাত্মিক ভাববিলাসের একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এই আংশিকতাকে দূর করে সাহিত্যের এক সামগ্রিক ও সর্বজনীন সংজ্ঞা নির্মাণের দাবি তোলে।

৩. পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংকট এবং সংস্কৃতির বিপর্যয়

বিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদ বা ধনিকতন্ত্রের চরম দেউলিয়াত্ব এবং বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলাকে প্রবন্ধগুলোতে মার্ক্সীয় সমাজতাত্ত্বিক আলোকেই বিচার করা হয়েছে।

- **পুঁজিবাদের অসারতা ও বিচ্যুতি (Alienation):** পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা শিল্পকে পণ্যে এবং শিল্পীকে স্রেফ মজুরে পরিণত করে। এর ফলে মানুষের আত্মিক সংকট তীব্রতর হয়। উইলিয়াম মরিস, জ্যাক লন্ডন, জন গলসোয়ার্দি থেকে শুরু করে হেমিংওয়ের মতো কালজয়ী লেখকেরা এই ব্যবস্থার অসারতা উপলব্ধি করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ রূপান্তরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।
- **ফ্যাসিবাদের নগ্ন আস্ফালন:** রুগ্ন ধনতন্ত্রের চরম ও ফ্যাসিবাদী রূপ সংস্কৃতির প্রধান শত্রু। নাৎসি প্রচারক

গোয়েবলসের কুখ্যাত উক্তি—"সংস্কৃতির নাম শোনামাত্র আমার হাত চলে যায় পিস্তলের বাটে"—প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদ কখনো শিল্প ও মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারে না।

৪. সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ (Socialist Realism) এবং সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ

১৮৪৮ সালের 'সাম্যবাদী ইস্তাহার'-এ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যে নতুন সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা দিয়েছিলেন, ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের মাধ্যমে তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

- **সামগ্রিক সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা:** সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে যখন মেহনতি মানুষ (শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী) রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার চালিকাশক্তি হয়, তখনই কেবল সাহিত্যের আংশিকতা দূর হয়ে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।
- **ব্যক্তি ও সমষ্টির মেলবন্ধন:** অস্কার ওয়াইল্ডের 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবাত্মা' প্রবন্ধের আলোকে দেখানো হয়েছে, পুঁজিবাদ মানুষের ব্যক্তিকতাকে অর্থ ও মুনাফার লোভে বিকৃত করে, পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রেই মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক সংহতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে। এটিই কডওয়েলের ভাষায়—"ব্যক্তি-স্বাধীনতার সর্বজন সম-অংশীদারিত্ব"।

৫. শিল্পীর স্বাধীনতা ও দ্বৈত সত্তার দ্বান্দ্বিক ঐক্য

মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বে শিল্পীর স্বাধীনতা কোনো সমাজবিচ্ছিন্ন স্বেচ্ছাচারিতা বা হাওয়া-ভাসা বুর্জোয়া বিলাসিতা নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা নিহিত থাকে সমাজের অমোঘ ঐতিহাসিক নিয়মকে চিনে নিয়ে প্রগতির পক্ষে দাঁড়ানোর মধ্যে।

- **মায়াকভস্কির সংগ্রাম:** কবি মায়াকভস্কি তাঁর কলমকে বন্দুকের মতো শাণিত করতে চেয়েছিলেন এবং দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শিল্পায়ন তালিকায় কবিতার স্থান দাবি করেছিলেন, যা শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।
- **পস্টস্কির কালান্তর আহ্বান:** সোভিয়েট কথাশিল্পী পস্টস্কির মতে, লেখকের আসল সার্থকতা সমাজ বা প্রতিবেশীদের থেকে আলাদা হয়ে অহংকার প্রকাশের মধ্যে নয়; বরং একই রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে লোক-হৃদয়ের অন্তহীন বেদনা ও গণ-আহ্বানকে নিজের শিল্পে বাঙ্ময় করে তোলার মধ্যে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, রণেশ দাশগুপ্তের এই প্রবন্ধচতুষ্টয়ের মূল নির্যাস হলো—সাহিত্য কোনো নিষ্ক্রিয় দর্পণ বা নিষ্কাম ঘরের সাধনা নয়; বরং এটি সমাজ পরিবর্তনের এক জীবন্ত ও গতিশীল হাতিয়ার। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সাহিত্য বুর্জোয়া বৃত্তায়ন থেকে মুক্ত হতে পারে। এই গ্রন্থটি মানুষকে প্রয়োজনের জিঞ্জির ছিঁড়ে সত্যিকারের 'স্বাধীনতার জগতে' (Realm of Freedom) উত্তরিত হওয়ার পথ দেখায় এবং সাহিত্যের একটি সর্বজনীন, মানবিক ও মেহনতি মানুষের অধিকারমুখী সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করে।